9-5-52

মহাপ্রস্থানের পথে

— ভ্রমণ কাহিনী —

শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল

চিত্রে উল্লেখিত স্থান পরিচিতি

দেবপ্রয়াগ : গড়বালের একটি প্রধান কেন্দ্র। বদরীনাথের পাণ্ডাদের বসতি। এখানে রামচন্দ্র মন্দির আছে। ভাগীরথী এবং অলকানন্দার সঙ্গমস্থল।

শ্রীনগর : কেন্দ্রীয় স্থান। কাছাকাছি বহু দেবালয় এবং অন্যান্য লোকালয় আছে। বাজারে বহুপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। কেদার বদরী যাত্রীদের জন্য ডাণ্ডী কুলীর আড্ডা।

রুদ্রপ্রয়াগ : এখানে রুদ্রেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে নীচে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম দেখা যায়। মন্দিরে 'রুদ্রেশ্বর' প্রস্তর নির্ম্মিত লিঙ্গ।

গুপ্তকাশী : এ-অঞ্চলের একটি প্রধান স্থান। যাত্রাসম্বন্ধীয় পুস্তক ও চিত্রাদি এখানে পাওয়া যায়। প্রধান মন্দিরের বিগ্রহ বিশ্বেশ্বর। তাহার পাশে আধুনিক পার্ব্বতী মন্দির। সম্মুখে মণিকর্ণিকা কুণ্ড।

ত্রিযুগীনারায়ণ : বৃক্ষহীন গ্রাম। এখানের ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির বিখ্যাত। মন্দিরের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড ও পশ্চিমে রুদ্র, বিষ্ণু ও সরস্বতী নামে তিনটি ছোট ছোট কুণ্ড আছে। কথিত আছে, এখানে শঙ্কর ও হৈমবতীর বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহের হোমাগ্নি তিন যুগ ধরিয়া প্রজ্বলিত রাখা আছে।

কেদারনাথ : তুষার মণ্ডিত গিরি-প্রাচীরের ক্রোড়ে কেদারনাথ। কেদারনাথের মন্দির উচ্চ মঞ্চের উপর নির্ম্মিত। গঠন ও অবস্থান দুই মহান। অবারিত দ্বার মন্দির। বিগ্রহ মহিষের পিঠের আকারের স্বাভাবিক এক প্রকাণ্ড প্রস্তর। মন্দিরের জগমহোনে কতকগুলি প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি এবং মধ্যস্থলে পিতলের একটি বৃষ মূর্তি আছে। মন্দির বৈশাখ হইতে আশ্বিন—ছয় মাস খোলা থাকে। বাজারে নানা দ্রব্যের দোকান আছে। উচ্চতা প্রায় ১২০০০ ফুট। তিনদিকে পর্ব্বত বেষ্টিত। এখান হইতে নিকটের মন্দাকিনী ও দুধগঙ্গার গর্জ্জন শোনা যায়।

উখীমঠ : কেদারের রাওল সাহেবের বাসস্থান এবং তাঁহার অধীন দেবস্থানগুলির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়। এখানে আছে ওঁকারনাথের বিশাল মন্দির, মন্দিরে আছে মান্ধাতার, কেদারনাথের ও মধ্যমেশ্বরের মূর্তি। শীতকালে কেদার ও মধ্যমের নিজ নিজ মন্দির যখন বন্ধ থাকে, তখন এইখানে তাঁহাদের পূজা চলে। ওঁকারনাথ পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ। উখীমঠ এ-অঞ্চলের বিশিষ্ট শহর।

শ্রীতুঙ্গনাথ : মন্দাকিনী ও অলকানন্দার উপত্যকাদ্বয়ের শীর্ষদেশে প্রায় ১২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। বসতিটি ছোট, জনবিরল এবং বৃক্ষহীন। এখান হইতে কেদার বদরী তুষারমণ্ডিত গিরিরাজি দেখা যায়। শ্রীতুঙ্গনাথের মন্দির প্রাচীন এবং বিশাল। শ্রীতুঙ্গনাথ পঞ্চকেদারের এক কেদার। শীতের ছয়মাস শ্রীতুঙ্গনাথে মন্দির বন্ধ থাকে।

চামোলি : আর এক নাম লাংগঙ্গা। বিশিষ্ট শহর, গড়বাল জেলার এক সব্‌ডিভিসনের হেড্‌কোয়ার্টার্স। নীচে অলকানন্দা বহিতেছে। বাজার দোকান আছে।

গরুড়গঙ্গা : এখানে গরুড়ের ছোট মন্দির আছে, তাহার নীচে গরুড়গঙ্গাতে স্নানের ঘাট।

যোশীমঠ : প্রাচীন স্থান। শ্রীবদরীর রাওল সাহেবের বাসস্থান ও দপ্তর এখানে আছে। রাওল সাহেবের মঠ-সংলগ্ন নৃসিংহ দেবী প্রভৃতি দেবতার স্থান। ইহা চারিদিকের পথের মিলন-কেন্দ্র। দক্ষিণে কুমাওনে যাতায়াতের পথ আছে। এখান হইতে ৯ মাইল পূর্বে তপোবন নামক প্রাচীন স্থান।

পাণ্ডুকেশ্বর : বিষ্ণুগঙ্গার তীরে অবস্থিত স্থায়ী বড় বসতি ও বাজার আছে। পাণ্ডুকেশ্বরের মন্দির দুইটি একটি চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। মন্দির দুটির অবস্থা জীর্ণ। একটি মন্দিরে পঞ্চবদরীর মধ্যে গণ্য যোগবদরীর মূর্তি আছে।

বদরীনাথ ঃ শ্রীবদরীধাম বৎসরের অর্দ্ধেক সময় মাত্র খোলা থাকে। উচ্চতা ১০৪৮০ ফুট। উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বদরী কেদার অপেক্ষা বড় শহর, যাত্রী সমাগমও বেশী। বাজারে হিমালয়জাত নানা দ্রব্যের ও খাবারের বড় বড় দোকান আছে। বদরীনাথের মন্দিরেও কেদারের মত অখণ্ড জ্যোতি জ্বলে।

নন্দপ্রয়াগ ঃ এখানে মন্দাকিনী পূব দিক হইতে আসিয়া অলকানন্দার সহিত মিশিয়াছে। সঙ্গমের নিকট কয়েকটি ভাঙ্গা মন্দির আছে।

কর্ণপ্রয়াগ ঃ এখানে পিন্দর নদ পূব দিক হইতে আসিয়া অলকানন্দায় মিশিয়াছে। কর্ণের মন্দির বৃহৎ, সঙ্গমের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। কথিত আছে, কর্ণ এখানে তপস্যা করেন।

খুঁটিনাটি

তীর্থযাত্রার সময়কাল—প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে শ্রীবদরীনাথের মন্দিরের দরজা খোলা হয়। সেই হিসাব করিয়া মোটামোটি একমাস আগে হ'তে যাত্রীরা হরিদ্বারে সমবেত হন।

প্রদক্ষিণ পথের নিশানা—হরিদ্বার হ'তে যাত্রারম্ভ। হৃশিকেশ হয়ে দেবপ্রয়াগ অবধি তপোলোক। দেবপ্রয়াগ হ'তে রুদ্রপ্রয়াগ অবধি দেবলোক। তারপর রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে একদিকে শ্রীকেদারনাথ অবধি ও অন্যদিকে চামোলী হয়ে শ্রীবদরীনাথ অবধি ব্রহ্মলোক। শ্রীবদরীনাথ হ'তে কর্ণপ্রয়াগ, মেহলচৌরী হয়ে রামনগর অথবা রাণীক্ষেত হয়ে ফিরলে তবে তীর্থপ্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়।

যানবাহন—পদব্রজে যায় বহু নরনারী। কিন্তু আজকাল প্রায় অধিকাংশ পথ মোটরবাসে যাওয়া যায়। এ ছাড়া কাণ্ডি, ডাণ্ডি ও ছোট ঘোড়া পাওয়া যায়।

আবশ্যিক জিনিসপত্র—ইদানীং প্রায় সকল আবশ্যিক সামগ্রীই রাস্তায় পাওয়া যায়। পথে আহার্য বস্তুর অসুবিধা নাই। উপযুক্ত গরম পরিচ্ছদ প্রয়োজন। পেটের অসুখ, মাথাধরা ও শ্রমজ্বরের জন্য কিছু ঔষধপত্র সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। জুতার ফোস্কা ও পায়ের ব্যথার মালিশ সঙ্গে থাকলে ভাল।

প্রতি দুই মাইল, তিন মাইল ও চার মাইল পার হ'লেই সাময়িক বসবাসের জন্য বিশ্রামাগার অর্থাৎ চটি পাওয়া যায়। চটিতেই আহার্য সামগ্রী মেলে। বাসনপত্রাদি চটিতেই পাওয়া যাবে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন পাণ্ডার প্রতিনিধি অর্থাৎ ছোড়েদার নিলে সকল দিকেই সুবিধা হয়।

একজন যাত্রীর পক্ষে হরিদ্বার হ'তে অন্ততঃ দু'শ টাকা সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। কুলী সঙ্গে নিলে আর এক-শ টাকা দরকার।

যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য দ্রব্যাদি

ধুতি, গামছা, জামা, সোয়েটার, কম্বল, তোষক, বালিশ, চাদর, কেড্‌স জুতা, পশমের মোজা, ছাতা, লাঠি, টর্চ, হ্যারিকেন লণ্ঠন, অয়েলক্লথ, দস্তানা, পাজামা, পশমের পা-টানা, পানের মশলা, সাগু, মিছরী, ইসবগুল, মাথার তেল।

কেদার-বদরীর পথে প্রতি ২।৩ মাইল অন্তর চটি আছে। নিম্ন লিখিত স্থানগুলির পাশে যে সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহা পূর্ব্বতন স্থান হইতে পরবর্ত্তী স্থানের 'মাইলে' দূরত্ব জ্ঞাপক। স্থানগুলির পাশে যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া হইল, তাহার অর্থ ফুটনোটে দ্রষ্টব্য।

হরিদ্বার	রামওয়াড়া ৪ +	যোশীমঠ ৬। + ● ∘∘:
হৃষিকেশ ১৪ + ●∘∘	**কেদারনাথ** ২। +:	বিষ্ণুপ্রয়াগ ২
দেবপ্রয়াগ ৪৪ + ●∘∘:		বলদেও ১ +
কোটী ১০ ●	এখান হইতে আবার	পাণ্ডুকেশ্বর ৫ + ●
শ্রীনগর ১১ + ● ∘∘	নালা ২৩	লামবগড় ২। +
ছাত্তিখাল ১০ ●	উখীমঠ ২। + ● ∘:	হনুমান চটি ৪ +
রুদ্রপ্রয়াগ ৭। + ● ∘∘	পোথল ভীটা ১০ ●	**বদরীনাথ** ৫ + ●∘∘
রামপুর ৭	বানিয়াকুণ্ড ১ +	
শুওরাপর ২ ●	চোপতা ১ +	প্রত্যাবর্ত্তন:
অগস্ত্যমুনি ২। + ∘	তুঙ্গনাথ ৩ +	চামোলী ৪৮
চন্দ্রাপুরী ৪	মণ্ডল ৯ +	শ্রীনন্দ প্রয়াগ ৭ ●∘
ভীরী ২। +	গোপেশ্বর ৪।	সোনলা ৩ ●
গুপ্তকাশী ৬ + ∘	চামোলী ৩ + ● ∘∘:	কর্ণপ্রয়াগ ১০ + ● ∘∘:
নালা ১	পিপলকুঠী ৯ + ●∘∘	আদিবদরী ১১ ● ∘
ফাটা ৭ ●	গরুড়গঙ্গা ৪ +	দুনার ঘাট ১২ ●
রামপুর ৪। +	পাতালগঙ্গা ৪।	মেহলচোরী ৫ ● ∘
ত্রিযুগীনারায়ণ ৫ +	গোলাপকুঠী ১ ●	গনাই ৯। + ● ∘
গৌরীকুণ্ড ৬ + ●	কুমার ২ + ∘	রাণীক্ষেত ২৬

হরিদ্বার হইতে:

১। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, ত্রিযুগীনারায়ণ এবং কেদারনাথ হইয়া বদরীনাথ যাইবার সময় ১৫ই এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই।

২। বদরী-কেদার ১৫ই এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর।

৩। কেবল বদরীনাথ, এপ্রিলের শেষ হইতে ১৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত।

হরিদ্বার হইতে গঙ্গোত্রী: ১৯৩ মাইল। যমুনোত্রী হরিদ্বার হইতে ১৬৬ মাইল
যমুনোত্রী হইতে গঙ্গোত্রী ৯৮ মাইল। গঙ্গোত্রী হইতে কেদারনাথ ১২১ মাইল

সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ:— ধর্মশালা +, ইন্সপেকসন বাঙলো ●, পোঃ আঃ ∘, পোঃ এবং টেলি আঃ ∘∘, হাসপাতাল:

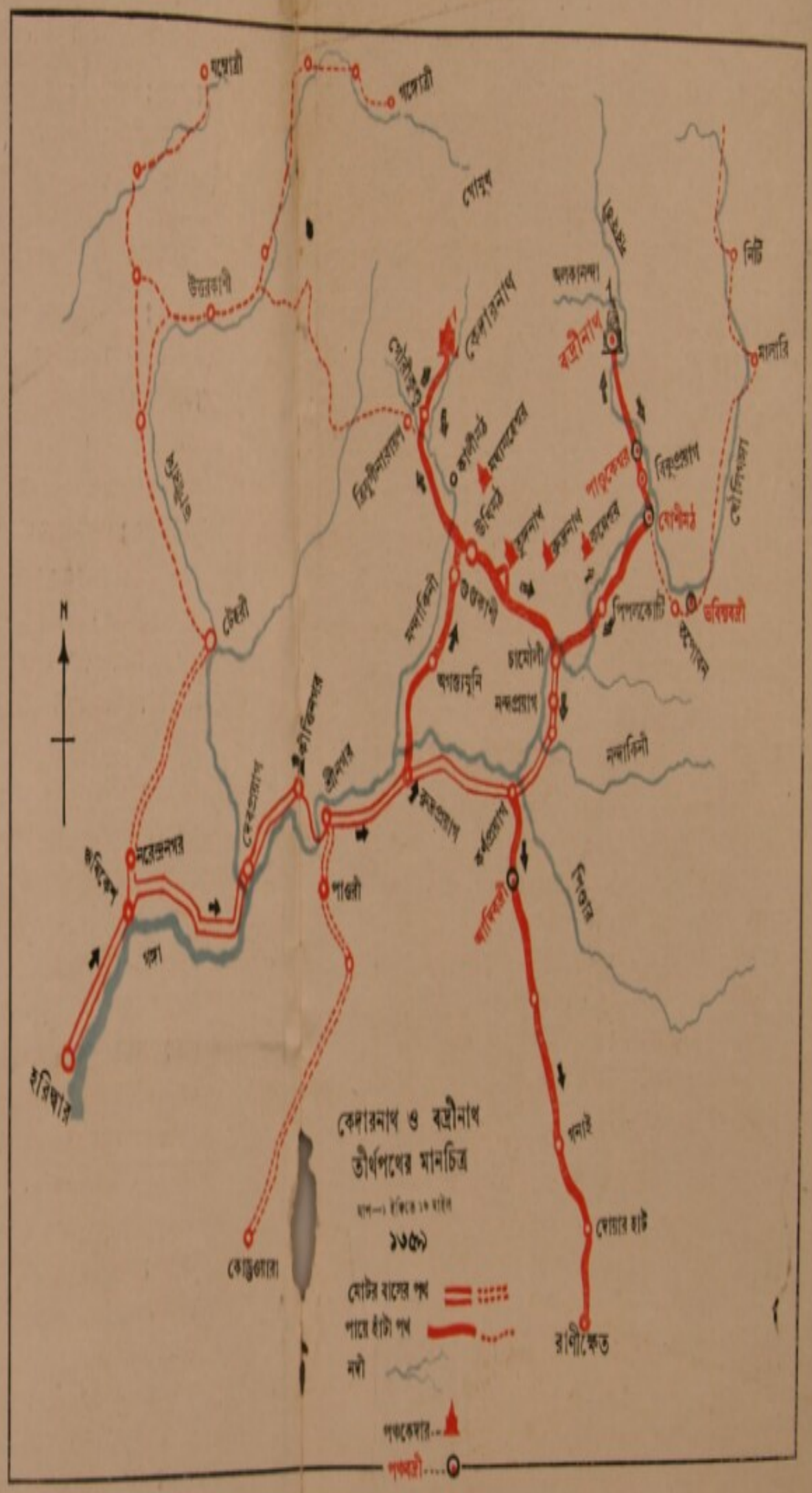

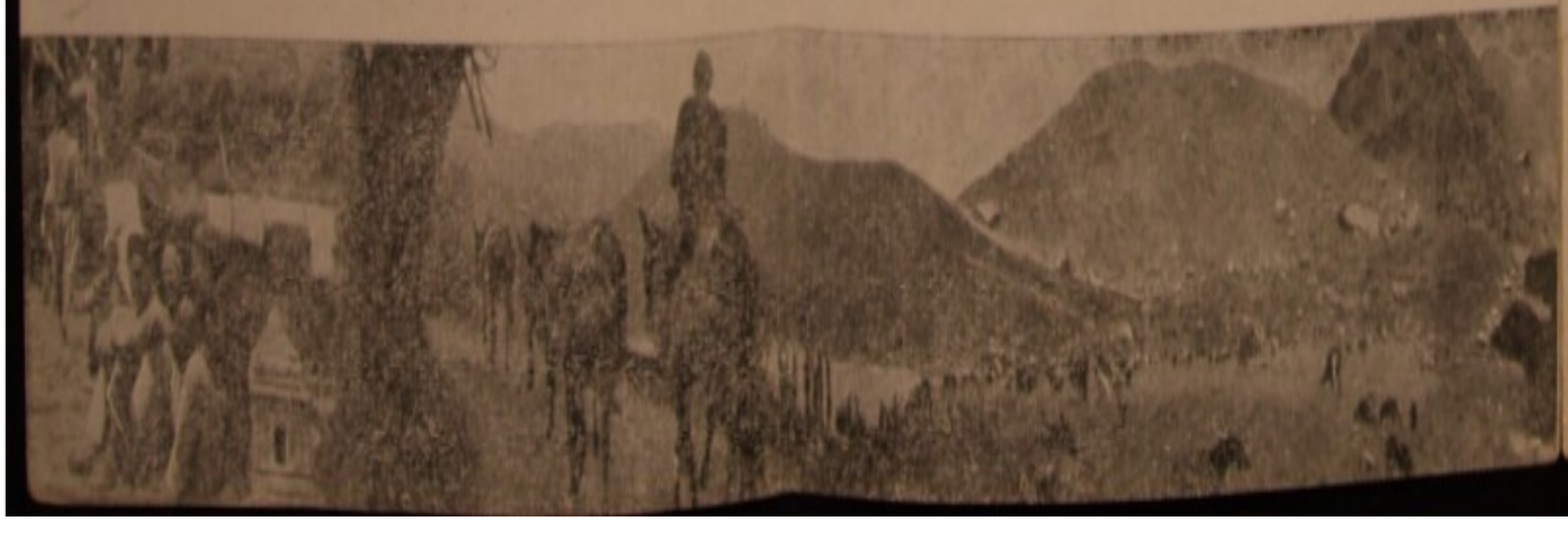

"মহাপ্রস্থানের পথে"

পূর্বালাপ

যুগ-যুগান্তর কাল থেকে ভারতবাসীর অন্তর তীর্থযাত্রার কথা ও কল্পনায় বৈরাগ্যচঞ্চল হয়ে উঠে তীর্থপথের পথিকের পদচিহ্ন অনুসরণ করে' আবহমান কাল ধরে' ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতবাসীর মনে গড়ে' উঠেছে। অধ্যাত্মজীবন সন্ধানের জন্য এদেশের ভক্তিপিপাসু এবং আনন্দভিক্ষু মানুষ বারম্বার ঘর ছেড়ে ছুটে গিয়েছে অজানা সমুদ্রতীরে, গহন অরণ্যলোকে, দুর্গম গিরিগুহায়, দুরারোহ পর্বতমালায়। ধনী নির্ধন, অশক্ত অক্ষম, পঙ্গু ভঙ্গুর—সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর অন্তরে চিরকাল ধ্বনিত হয়ে এসেছে দুর্গ দুর্গম তীর্থপথের ডাক। প্রাচীন ভারতের মহাত্মা বেদব্যাস, গৌতম বুদ্ধ, আচার্য্য শঙ্কর, গুরু নানক, কবীর, রামানুজ, তীর্থঙ্কর—তাঁদের মর্মলোকেও একদা এই ডাক এসে পৌঁছেছিল। কালান্তরক্রমে একালের রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র— তাঁরাও সঙ্কটসঙ্কুল তীর্থযাত্রার অচ্ছেদ্য আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বার বার বেরিয়ে পড়েছিলেন। কেউ খুঁজেছেন দেবত্বলাভের পথ, কেউ চেয়েছেন সাধু-মহাত্মা-মহাপুরুষের দিব্যদর্শন, কেউ বা সন্ধান করেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনো নির্জন নিভৃত পার্বত্য তপোবনে তপস্যার আশ্রম। এই ভাবে কালক্রমে ভারতবর্ষের সকলপ্রকার ঐতিহ্য-কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে যুগযুগান্তরের মহাপুরুষগণের পরম পুণ্য অবদানে। সমগ্র ভারতখণ্ডে, জম্বুদ্বীপে, সাগরে, প্রান্তরে, মরুলোকে, অনামা নদীতীরে, বিজন ভীষণ অরণ্যপথে, হিমালয়ের গিরিসঙ্কটের স্তরে স্তরে—তাঁরা আপন আপন মহিমা ও কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন মন্দিরে আর প্রস্তরে, প্রতিমায় আর বিগ্রহে, স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, তপোবনে আর গিরিগুহায়। ঐতিহাসিক কালে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তরুণ যুবক শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মহাভারতধর্ম্মের আকর্ষণে গিয়েছিলেন চিরতুষারমৌলী হিমালয় পর্বতমালার বিঘ্নসঙ্কটের জটিলতার মাঝখানে। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভগবান কেদারনাথ ও বদরীনাথের বিশ্ববিশ্রুত দেবস্থান। আচার্য শঙ্করের সেই উত্তরধামের আকর্ষণে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ তীর্থপথিক হিমালয় পর্বতের তুষারধবল প্রান্তরের দিকে অভিযান করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন তপোলোক পেরিয়ে দেবলোকের দিকে,—দেবলোক পেরিয়ে ব্রহ্মলোকে। তাঁদের সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত ভারতবাসীকে শত শত বছর ধরে' অধ্যাত্ম আনন্দের প্রতি আকৃষ্ট করে' এসেছে। এই পথের পথিকমাত্রেই জানেন, এই তীর্থযাত্রার সুদীর্ঘ পথ প্রতি বৎসর নবনসন্ত সমাগমে আনন্দে আবেগে শ্রদ্ধায় ভক্তি-বিহ্বলতায় বেদনায় পিপাসায় যন্ত্রণায় কল্পনায় নিত্য মুখর হয়ে ওঠে। প্রাচীন কালের কবিগুরু বেদব্যাস তাঁর মহাভারতে স্বর্গারোহণের বর্ণনায় এই তীর্থপথকেই **'মহাপ্রস্থানের পথে'** বলে অভিহিত করেছিলেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

— মহাপ্রস্থানের পথে —

কুশী-লবগণ

প্রবোধ : বসন্ত চৌধুরী। গোপাল ঘোষ : তুলসী চক্রবর্ত্তী। ব্রহ্মচারী : অভি ভট্টাচার্য্য।
জ্ঞানানন্দ : শিশির বটব্যাল।
পাগলা সাধু : নীতিশ মুখোপাধ্যায়।
অঘোর নাথ : গৌরীশঙ্কর।
চৌধুরী মশাই : ললিত চট্টোপাধ্যায়।
অমরা সিং : নটবর। পণ্ডিত শুকুল : কমল মিশ্র।
অন্ধ : মনোজ চট্টোপাধ্যায়। খঞ্জ : কেষ্ট দাস।
রাণী : অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। রাধারাণী : মায়া মুখোপাধ্যায়। নারায়ণগিরিমায়ী : মলিনা দেবী।
দিদিমা : রাজলক্ষ্মী। পিসি : বন্দনা দেবী।
বামুন বুড়ী : মনোরমা। চাকর মা : আশালতা।
রাধারাণীর মা : মায়া বোস।
রাঙ্গাশাড়ী : রমা দেবী। নির্ম্মলা : কনকলতা। বিহুয়া : মুকুলজ্যোতি। ভৈরবী : প্রতিমা বোস।
গাড়োয়ালি মেয়ে : জয়শ্রী সেন।

— সংগঠনে —

পরিচালক : কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়।

সুর-শিল্পী : পঙ্কজ কুমার মল্লিক। চিত্র শিল্পী : অমূল্য মুখোপাধ্যায়। শব্দ-যন্ত্রী : শ্যামসুন্দর ঘোষ।
শিল্প-নির্দ্দেশক : সুধেন্দু রায়। সম্পাদক : সুবোধ রায়। রসায়নাগারাধ্যক্ষ : পঞ্চানন নন্দন।
সেট-শিল্পী : পুলিন ঘোষ। পট-শিল্পী : রামচন্দ্র সেণ্ড। গীতকার : পণ্ডিত ভূষণ, বি এম্ শর্ম্মা।
মঞ্চ সজ্জাকর : রবি চট্টোপাধ্যায়। স্থির চিত্র : দীনেশ দাস। রূপসজ্জা : মদন পাঠক। পরিচ্ছদ ব্যবস্থাপক : যতীন কুণ্ডু। শিল্পী-সংগ্রাহক : বীরেন দাস। ব্যবস্থাপক : ছবি ঘোষাল ও কেষ্ট হালদার।

— সহকারীবৃন্দ —

পরিচালনায় : ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত ভূষণ, নির্ম্মল মিত্র।
সুর-শিল্পে : বীরেন বল। চিত্র-শিল্পে : জ্ঞান কুণ্ডু, দুর্গা রাহা, নরেন মজুমদার।
শব্দ-যন্ত্রে : প্রদ্যোৎ সরকার। রসায়নাগারে : বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার, তারাপদ চৌধুরী।
সেট-নির্ম্মানে : রতন প্যাটেল। রূপসজ্জায় : নারায়ণ মজুমদার, গোপাল হালদার।
শিল্প নির্দ্দেশনায় : প্রহ্লাদ পাল। স্থির-চিত্রে : প্রীতিকর হালদার, ভোলানাথ কয়াল।
শিল্পী-সংগ্রহ : বীরেন দাস। ব্যবস্থাপনায় : রগেন হালদার।

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

:কেদার বদরীনাথ মন্দির কমিটির সেক্রেটারী শ্রীপুরুষোত্তম দাস বাগোয়াড় : নৌরেন সেন, রাধাঃ রি দত্ত। বদরীনাথের পাণ্ডা হর্ষ প্রসাদ (পঞ্চভাই), :দেবপ্রয়াগ, গাড়োয়াল। . -কদারনাথের পাণ্ডা কিশোরী প্রসাদ শুকলা, পোঃ গুপ্তকাশী, গাড়োয়াল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে।.

একমাত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড।

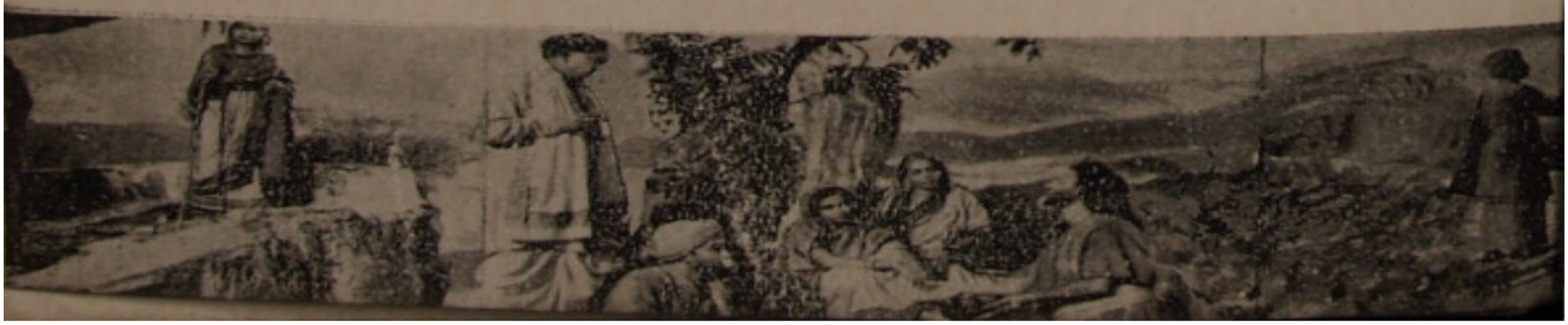

মহাপ্রস্থানের পথে

প্রবোধকুমার সান্যাল

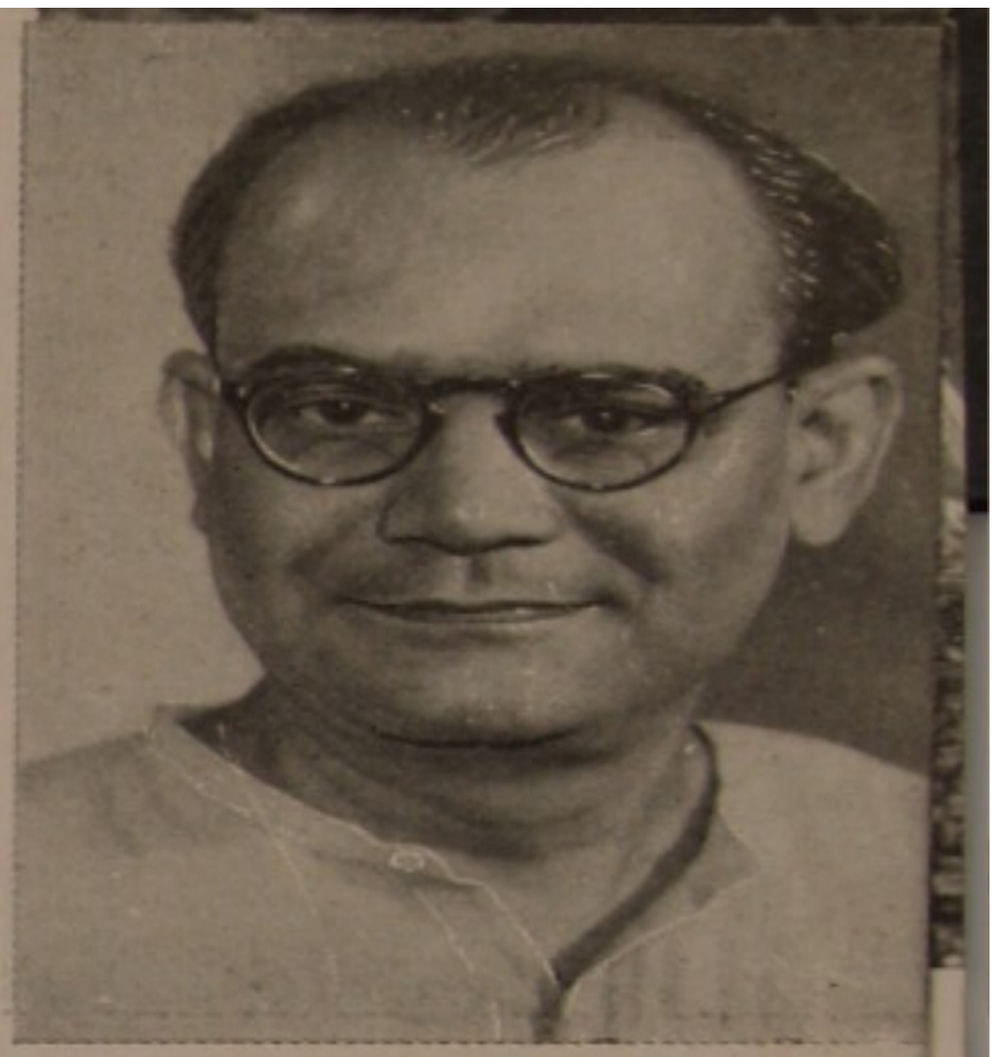

ভারতীয় সাংস্কৃতির একটি প্রধান পরিচয় ভারতবর্ষের অসংখ্য তীর্থস্থান। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্প শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে তীর্থ পথের দেবমন্দিরে। এই তীর্থ-পথ যত দুর্গমই হোক, তারা আপন আপন মহিমায় চিরকাল ধরে' মানুষকে আকর্ষণ করেছে। পুণ্যলাভের কামনায় মানুষ গিয়েছে বনে জঙ্গলে, ছুটেছে সমুদ্রপথে, ঝাঁপ দিয়েছে অনামা নদীর তুফান-তরঙ্গে, পেরিয়ে গেছে দুঃসাধ্য মরপ্রান্তর—জীবন-মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে পদে পদে। বাধা, ক্লান্তি, উপবাস একদিকে—অন্যদিকে নৈরাশ্য, আতঙ্ক, ব্যাধি-বিকার—কিন্তু মানুষ ওদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি। দুর্লভের আকর্ষণ সকল বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

ভারতের শিয়রে আবহমান কাল থেকে নগরাজ হিমালয় যেন মহাযোগে আসীন। তাঁর ললাটের জটা-জটিলতার থেকে নেমে এসেছে অগণ্য স্রোতস্বিনী—তারা যেন সেই দেবাদিদেবের আনন্দেরই ধারা। মহাযোগীর শিরশ্চূড়া চিরতুষারে আবৃত; তাঁর অঙ্গের স্তবকে স্তবকে তীর্থ-মন্দীরগুলি মণিমাণিক্যের মত জাজ্বল্যমান। ওদের মধ্যে বদরিনাথ, কেদারনাথ, কৈলাসনাথ—ইত্যাদির দর্শন কোটি কোটি নর-নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। ওদের ওই বিশালতার মহিমা মানুষকে যেন দেবলোক থেকে আহ্বান জানায়—সেই আহ্বান শুনে

একদিন তীর্থযাত্রীর দল আত্ম-বিস্মৃত অস্থিরতায় ওই দুঃসাধ্য দুর্গম তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়ে। সংসারের মায়া, স্বজনের মমতা, সম্পদের মোহ—সমস্তই তাদের পিছনে পড়ে থাকে।

একদিন হঠাৎ আমিও বেড়িয়ে পড়েছিলাম ওই সুদূর হিমালয়ের তীর্থপথে। মনে পড়ে আমার তখন বাসা ছিল হরিদ্বারে। কিন্তু যাবার আগে আমার মনে ছিল জটিল প্রশ্ন, ছিল উদ্দীপনা, ছিল ভয়-ভাবনা। হয়ত পরমার্থ লাভের অস্পষ্ট কোন জটিল ক্ষুধাও তখন তরুণ মনে বাসা বেঁধে ছিল; হয়ত বা সংশয়াচ্ছন্ন মন অজ্ঞানের অন্ধকারে কোথাও কিছু খুঁজে পাবার জন্যও এখানে ওখানে হাতড়ে ফিরছিল। মনে পড়ে সেদিন চিত্তলোকে একটা প্রবল আলোড়ন এবং প্রবলতর ঝড়-ঝাপটা বয়ে চলেছে।

নিজের ভিতরকার তাড়না আমাকে বারবার ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ভারত-পরিক্রমায়। সেতুবন্ধে, কোনারকে, সোমেডাগন প্যাগোডায়, দ্বারকায়, অজন্তায়, লাণ্ডিখানায়—সেই পরিক্রমা কিন্তু শেষ হয়নি। সেদিন সেই অন্তর-তাড়নাই বুঝি আমাকে নিয়ে চলেছে হৃষিকেশ ছাড়িয়ে, দেবপ্রয়াগ পেরিয়ে। বাইরে হিমালয়ের অনন্ত নিস্তব্ধ মহাশান্তি—কিন্তু আমার মধ্যে নিগুঢ় অসন্তোষ, আর অতৃপ্তি—আমার সন্ধানী মন ফিরছে পথে পথে। কিছু আমার চাই, কিন্তু তার সত্য স্বরূপ আমার জানা নেই। অনেক সময় যেতে হয়েছে লোকচক্ষুর বাইরে; অনেক সময় বা পিছন ফিরে নিজের

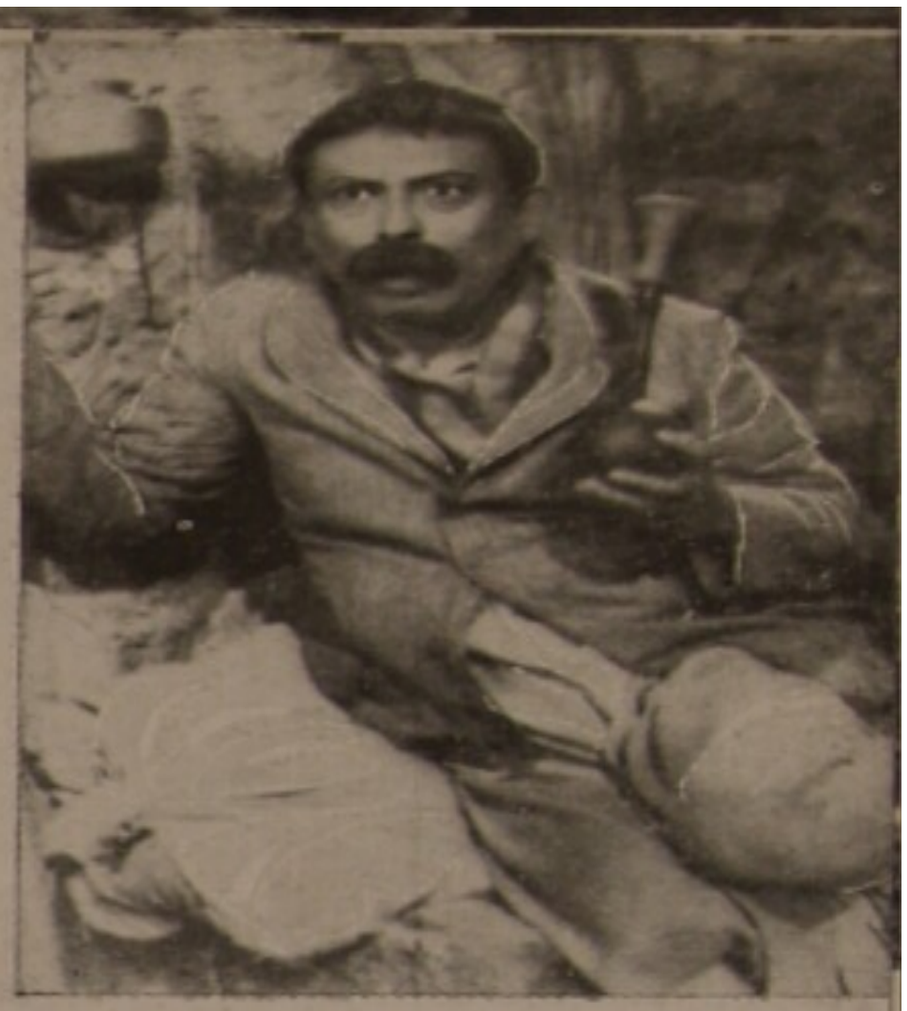

পায়ের চিহ্নও মুছে দিয়ে যেতে হয়েছে। নিজের প্রশ্ন নিজেই কান পেতে শুনতুম—। একথা জানতুম সে-প্রশ্ন উঠে দাঁড়ায় অস্তিত্বের মূল কেন্দ্র থেকে—যেটাকে বলে পরম পিপাসা, প্রাণসত্তার অন্তহীন অতৃপ্তি—যার থেকে উদ্ভাবন ঘটে ভগবৎ-সৌন্দর্যবোধের, আত্মোপলব্ধির, মহৎ আনন্দের, কাব্যসাহিত্যের।

মনে পড়ছে হরিদ্বারে প্রথম আলাপ ব্রহ্মচারী আর জ্ঞানানন্দের সঙ্গে। কৌতুকপ্রিয়, চটুল, সদানন্দ এবং ঔদরিক ব্রহ্মচারী। সন্দেহ ছিল, সে মেদিনীপুরের কোন এক বিপ্লববাদীদলের লোক। পুলিশের চোখ এড়িয়ে সে পাহাড় পর্বতে আত্মগোপন করেছে—কিন্তু আমার গ্রন্থে সেকথা সেদিন প্রকাশ করা বিপজ্জনক ছিল। মনে পড়ছে হৃষিকেশের কালীকম্বলীবাবার ওখানে প্রথম আলাপ গোপাল ঘোষের সঙ্গে। তিনি আমাকে দেখেই চিনলেন, আমি নাকি জাতসাপ। তারপর একে একে সবাই। বামুনবুড়ি, কুব্জদেহ চারুর মা, নির্মলা, রাঙ্গাশাড়ী, মনসাতলার মাসী, পণ্ডিতজী, সুকুল আর সাধু। ওরা সবাই সাধারণ—অতি সাধারণ—কিন্তু ওই অন্তহীন গিরিপথের বিচ্ছিন্ন জগতে ওরা ছিল অপার্থিব, ছিল অনন্যসাধারণ। ওদের ভক্তি, অনুরাগ, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

বিজনী, ছাতিখাল, ব্যাঘট, দেবপ্রয়াগ পেরিয়ে আবার জুটলো নতুন সঙ্গী। অঘোরবাবু, রাধারাণী আর তার মা। রাধারাণী

স্বভাবকোমল—সে তীর্থে এসেছে পুণ্যলাভের কামনায়। সহোদরার মত তার আচরণ, নিষ্কলুষ তার মন। হঠাৎ রামপুর চটিতে অঘোরবাবুর সঙ্গে বিতর্ক বাধলো ব্রহ্মচারীর। হঠাৎ নাটকীয় ভাবে জানলুম, রাধারাণী এক পতিতা নারী। ঘটনাচক্রে সেদিন একা চলে গিয়েছিলুম নিজের পথে।

মনে পড়ছে ঠিক সেইদিন সন্ধ্যারাত্রির কথা। চন্দ্রা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমে অন্ধকারে আমার পথ হারানো। চারিদিকে বনময় পর্বত, অন্ধকারে ভয়চকিত আমার মন। সহসা পিছনে ছমছমিয়ে এসে দাঁড়ালো এক ভৈরবী। সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের অলঙ্কার, পরনে গৈরিকবাস, দুই হাতে শিঙ্গা, আর কমণ্ডলু। চঞ্চল এক পাহাড়ী মেয়ে। মেয়েটি সেদিন পরদেশী পরিব্রাজককে নদীসঙ্গম পার করিয়ে পথ দেখিয়ে চলে গিয়েছিল। গিয়েছিল নদীতীরের পথে—অন্ধকার অজানায়। তার সেই আকস্মিক আবির্ভাব আজও আমার কাছে রহস্যভরা। আজও তা'র কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।

চন্দ্রাপুরী ছেড়ে আবার চললুম নিজের পথে। পিছনে পড়ে রইলো রুদ্রপ্রয়াগ, আর সেই রুদ্রপ্রয়াগের ঘাটের পাশে সেই মাতৃ-রূপিনী নারায়ণগিরিমায়ীর আশ্রম—তাঁর পাশে সেই দুটি শীর্ণকায়া তরুণী সন্ন্যাসিনী—সোনি আর রোঙ্গি। আর রইলো পিছনে গুপ্তকাশী, ত্রিযোগী-নারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, চীরবাসা ভৈরব আর রামওয়াড়া—শীতার্ত দেহে তুষার বর্ষণের ভিতর দিয়ে পৌঁছেছিলুম কেদারনাথে। রোগে, জ্বরায়, যন্ত্রণায়—কত যাত্রী পিছনে পড়ে রইলো, তাদের কথা আজও

ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি কেদারনাথের সেই উত্তুঙ্গ ধবল মহিমা, ভুলতে পারিনি যন্ত্রণা-জর্জর তীর্থযাত্রীর আত্মহারা ভক্তি-বিহ্বলতা। সেদিন আমাদের পিছনের পথ তুষারপাতের ফলে লুপ্ত হ'য়েছিল।

মনে পড়ছে মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে পুরাকালের বাণরাজার দেশে পৌঁছান। বাণরাজার কন্যা উষার নামে উখীমঠ। প্রাণান্তকর চড়াই পথ ছিল প্রায় চারদিন। তারপর তুঙ্গনাথ আর পাঙ্গরবাসার অরণ্য। ওই পথে গোপালদার রসরসিকতা, বামুন বুড়ীর কচকচি, আর চারুর মার মুখ থেকে তার গৃহপালিত গরুর গল্প। সেই নিস্তব্ধ পার্বত্য উপত্যকাতেও সেদিন বাস্তব জীবনের কলরব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। এমনি করে বাইশ দিন হেঁটে চামোলির ধর্মশালায় এসে আমি রোগশয্যায় শুয়েছিলাম। বদরীনাথ পৌঁছতে তখনো চারদিন বাকী।

অলকানন্দায় অবগাহন-স্নানের ফলে সেদিন আমার ব্যাধিবিকার শান্ত হয়েছিল। তারপর পিপলকুঠী, গরুড়গঙ্গা, কুমারচটি, আর সিংহদ্বার পেরিয়ে যোশীমঠে পৌঁছেছিলুম। কত গঙ্গা পথে পথে। আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা আর ধবলীগঙ্গা, পিন্দারগঙ্গা আর বিষ্ণুগঙ্গা। তারপর পাণ্ডুকেশ্বর আর লামবগড়ের পথ। কত মার্চুলের পাহাড়, কত পুরাকীর্তি, কত ভুর্জপত্র আর রুদ্রাক্ষের বন! এই পথ দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী। এদিকে যেন কোথায় আছে নন্দনকানন। এমনি করে গিয়ে পৌঁছলুম হনুমানচটিতে।

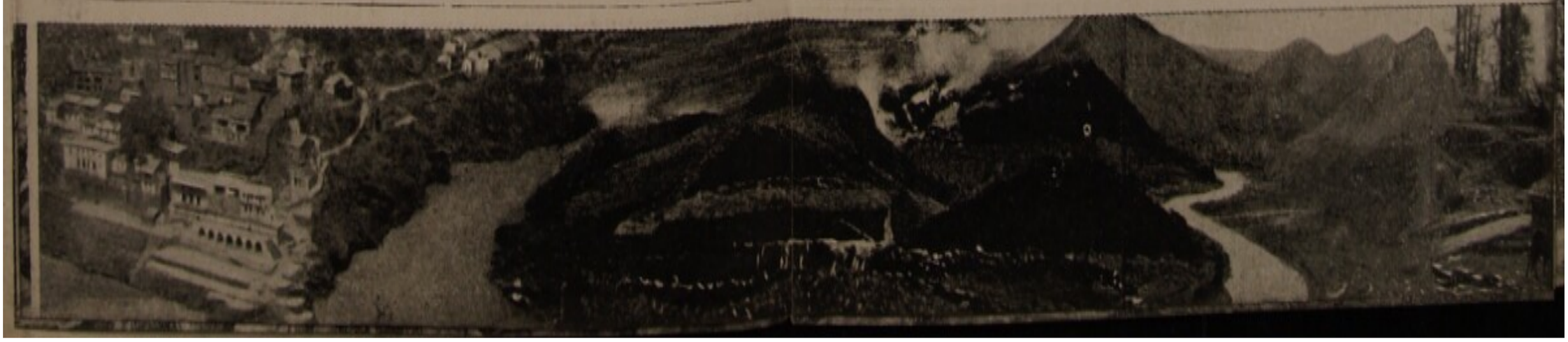

হনুমানচটির থেকে বদরীনাথ আন্দাজ পাঁচ মাইল পথ। পথ অতিশয় সঙ্কটাপন্ন ছিল সেদিন—চড়াই পথ ছিল দুঃসাধ্য। পথের এক বাঁকে দূরের থেকে প্রথম চোখে পড়ে বদরীনাথের স্বর্ণচূড়া, সেই দৃশ্যদর্শনে পরিশ্রান্ত যাত্রীর সমগ্র অন্তর মথিত করে' চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে আসে। তারা ভগ্ন কম্পিত কণ্ঠে কেঁদে ওঠে—জয় বদরী বিশাললাল কি জয়।

আজও ভুলিনি আমার মনে সেদিন ছিল সংশয়ের যন্ত্রণা। দেখলুম জন্মান্ধ যাত্রী চলেছে দেবদর্শনে, দেখলুম নুব্জদেহ, পঙ্গু আর খঞ্জ তীর্থযাত্রী—দেখলুম তাদের অখণ্ড বিশ্বাস। বিশ্বাসের পথ তারা আমাকে দেখিয়েছিল বৈ কি। দেখিয়েছিল আত্মসমর্পণের পথ, অহংবুদ্ধি বিসর্জনের পথ। দেবতাত্মা হিমালয়কে সেদিন আশ্চর্য মনে হয়েছিল।

মন্দিরের বাইরে এসে পথের এক শিলাজতুর দোকানে এক বিধবা তরুণীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে আলাপ। মন্ত্রদীক্ষিতা, ব্রহ্মচারিণী, ভক্তিমতী মেয়ে। অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যে মেয়েটি মুখর, অজস্র আনন্দ-উচ্ছলতায় আত্মবিস্মৃত। তিনি তাঁর নিজের নাম রেখে গেছেন রাণী। উত্তর প্রদেশে তাঁর বাসা—তিনি এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। মনে পড়ছে সেদিন তিনি আমার কৈলাস ভ্রমণের পথ অবরোধ করেছিলেন। অতঃপর বদরীনাথে তিনি আমাদের দলকে ছেড়ে চলে যান, কিন্তু কয়েকদিন পরে কর্ণপ্রয়াগ থেকে তিনি আমাদের সহগামিনী হন এবং শেষ দিন পর্যন্ত আমরা পাশাপাশি চলতে

থাকি। পথে কখনও এসেছে বর্ষা, কখনও বা বসন্ত। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পেরিয়েছি আধবদরী আর পিন্দারগঙ্গার পথ,—মেহলচৌরী, দ্বারীহাট আর রাণীক্ষেত। মনে পড়ছে বনময় পর্বতের সানুদেশে সুশীতল ঝরণার ধারের ছায়াপথে তিনি রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে বসেছেন জপে:— দেখেছি তাঁর একাগ্রতা, দেখেছি তাঁর শ্রান্ত আয়তচক্ষে বিড়ম্বিত জীবনের অশ্রুর আভাস। ট্যারাপিসি তাঁকে অসম্মানের আঘাত করেছে, দিদিমা করেছেন সস্নেহ শাসন—কিন্তু সেই আঘাত আর শাসনের খরতাপে পদ্মের কোরক সেদিন শতদলে বিকশিত হয়েছিল। ছবির মতো আজও দেখতে পাই দু'জনে দুই ঘোড়া নিয়ে সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। পথের দুই পাশে অরণ্য পুষ্পের সৌরভ প্রসারিত, নির্ঝরের কলতানে মুখরিত—লতাবিতানের ফাঁকে ফাঁকে আমরা বিশাল হিমালয়ের শোভা দেখে দেখে চলে যেতুম। কখনও দেখতুম অস্তাচলের চূড়ায় নেমেছেন সূর্যদেব—চিড় আর পাইনের বনে অরণ্যপক্ষীর সান্ধ্যকাকলীতে মুখরিত পথ, নীচের নদীতে নেমেছে ছায়ান্ধকার। মনে পড়ছে জ্যোৎস্না রাত্রে সেই গগাস চটীর ধার। পাহাড়ের ধারে পাষাণ প্রতিমার মত তিনি আসীন।

জীবন কি ব্যর্থ?—এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। আনুষ্ঠানিক জপ তপ সাধনার বাইরে আর কি কোনো সার্থকতার পথ নেই?

রাণীর কোনো প্রশ্নের জবাব ছিল না আমার কাছে। কিন্তু

তাঁর নিশ্বাস পড়েছিল আমার পাশে—সেই নিশ্বাসে পথের দু'পাশের পাইন আর ঝাউয়ের বন ফুঁপিয়ে উঠেছিল।

রেলপথের প্রান্তে এসে একদিন তাঁকে বিদায় নিতে হ'য়েছিল। সেদিন তাঁর দুই চক্ষে উচ্ছ্বসিত ছিল জীবন মথিত করা গভীর প্রশ্ন। বিশ্বাস করো কি ইহকাল? বিশ্বাস করো কি পরকাল আর পুনর্জন্ম? বিশ্বাস করো কি প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী?

সেই প্রশ্নের নিঃশব্দ উত্তর ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে সেদিন ওই অন্তহীন মহাপ্রস্থানের পথে।

পরিশেষে একটি কথা বলে যাই। আমি লেখক, কিন্তু পরিব্রাজক বলেও আমি অনেকের কাছে পরিচিত। আমার জীবনের খণ্ডকালের কাহিনীকে যিনি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে' ভারতের জনসাধারণের সামনে আজ তুলে ধরলেন তাঁর কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গচ্ছিত রইলো। আমার

বইখানির প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং ঔৎসুক্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। হয়ত অনেকেই জানেন না তিনিও আমার মতো হিমালয়ের দুর্গম তীর্থভ্রমণের পথিক, বহুদেশের বহু দেবস্থান পরিক্রমায় তিনিও সিদ্ধপাদ। এই তীর্থভ্রমণ কাহিনীকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত করে' তীর্থযাত্রার প্রতি তিনি তাঁর শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতার দুর্লভ পরিচয় স্থাপনা করেছেন।

লেখকের জীবন-কাহিনীকে নিয়ে চিত্রনির্মাণ এদেশে যেমন অভিনব তেমনই অসমসাহসিক প্রচেষ্টা —বিশেষতঃ সেই আধুনিক লেখক যখন সশরীরে জীবিত রয়েছেন।

এই গ্রন্থের চিত্রপরি-চালনায় এবং ব্যবস্থাপনায় যে সকল শিল্পী, গুণী, কারুকার ও চিত্রবিশারদগণ সহায়তা করেছেন তাঁদের সঙ্গেও আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়ে গেল।

সঙ্গীতাংশ

[১]

সাধুর গান—

রাম নাম ঘনশ্যাম নাম
শিব নাম সিমর দিন রাত
হরি নাম সিমর দিন রাত
জনম সফল তু করলে অপ্‌না
মানলে মেরী বাত ॥
পঞ্চ পাণ্ডোঁ নে জিস্‌ পথ্‌ পে
কিয়া মহাপ্রস্থান
উস পথ পে চলে জো ভী প্রাণী
উস্‌কা হো কল্যাণ।
ভুল যা তু জগকী সব বাতেঁ
ভুল ন পর ইয়ে বাত্‌ ॥

— বি. এম. শর্ম্মা

[২]

দ্বিতীয় সাধুর গান—

তু ঢুঁঢ়তা হ্যায় জিস্‌কো বস্তীমেঁ ইয়া কি বনমেঁ
উয়ো সাঙওয়ারা সলোনা রহতা হ্যায় তেরে মন মেঁ।
মস্‌জিদ মেঁ মন্দিরোঁ মেঁ, পর্ব্বত কী কন্দরোঁ মেঁ
নদিয়োঁকে পানিয়োঁ মে, গহরে সমন্দরোঁ মেঁ
লহরা রহা হ্যায় উয়োহী, খুদ অপনে বাঁকপণ মে ॥
হর ডরে মে খো হ্যায়, হর ফুল্‌ মে বসা হ্যায়
হর চীজ্‌ মে উসীকা জলওয়া ঝলক রহা হ্যয়
হরকত উয়ো কর রহা হ্যয়, হর ইক্‌ কে
তন বদন্‌ মে ॥
ক্যা খোয়া? ক্যা কমায়া? ক্যা ভায়া
কুঁা ন ভায়া?
ক্যা সোচে জা রহা হ্যায়? ক্যা পায়া
ক্যা ন পায়া?
সব ছোড় দে উনী পর, বস্তী মেঁ রহ কি বন্‌ মেঁ ॥

— পণ্ডিত ভুষণ

[৩]

শিবস্তুতি—

জয় শিব ওঙ্কারা
জয় জয় শিব ওঙ্কারা
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব অর্দ্ধাঙ্গী ধারা,
জয় জয় শিব ওঙ্কারা
ওঁ হর হর হর মহাদেব।
জয় শিব ওঁঙ্কারা জয় শিব ওঁঙ্কারা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব অর্দ্ধাঙ্গী ধারা
শিব ওড়ন মৃগ ছালা
শিব রহতে মত্‌বালা
শিব পার্ব্বতী প্যারা, শিব উপর জলধারা
জয় জয় শিব ওঁঙ্কারা
ওঁ হর হর হর মহাদেব।

[৪]

শিবস্তোত্রম্‌—

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক্‌ শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো
ভূতেশ ভীত-ভয় সূদন মাম নাথং
সংসার দুঃখ গহন জ্জগদীশ রক্ষ
হে পার্ব্বতী হৃদয়-বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ্‌ প্রমথনাথ গিরীশ [illegible]
হে বামদেবভবরুদ্র পিণাক পাণে
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ
বিশ্বেশ বিশ্ব ভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাভিবেশ
হে বিশ্ব-বন্দ্য করুণাময় দীন বন্ধো
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

[৫]

বিষ্ণু স্তোত্রম্—

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতি মহাত্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড় বাহনমুজ্জনাভম্ ।
গ্রাহাভিভূতবর বারণ মুক্তি হেতুম্
চক্রায়ুধং তরুণ বারিজ পত্র নেত্রম্ ।

[৬]

আরতি—

যো পাং পুষ্পম্ বেদঃ
পুষ্পবান প্রজাবান পশুমায় ভবতি
চন্দ্রমা বা অপাম্ পুষ্পম্
পুষ্পবান প্রজাবান পশুমান ভবতি
যঃ এবম্ বেদঃ যো
পামায়তাম্ বেদঃ আয়ত্তবান ভবতি।

[৭]

মীরার ভজন—

সাধন করন চাহীরে মনুয়া ভজন কর ন চাহী
প্রেম লগানা চাহীরে মনুয়া প্রীত করন চাহী।
তুলসী পুজন সে হরি মিলে তো
মৈ পূঁজু তুলসী ঝাড় ।
পাথ্থর পুজন সে হরি মিলে তো
মৈ পূঁজু পহাড় ।
দুধ পীনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎসওয়ালা
মীরা কহে বিনা প্রেমসে নহী মিলে নন্দলালা ।

[৮]

দ্বিতীয় সাধুর গান—

দিলওয়ালে ! দিলগীর হুয়া ক্যা
সোচ রহা হয় তু ?
সুখ অওর দুখকো সমঝ বরাবর
ধীরজ ধর সাধু ।
খোটী দুনিয়া ভলে বুরে কী
কর ন সকে পহ্চান
জ্ঞানওয়ান পর কীচ উছালে
মূরখ কে দে মান
তু অপমান কো মান সমঝকর
পৌছ ডাল আঁসু ।

হঁসী-খুশী-আওর রোনা-ধোনা
জগ্কে ঝুটে খেল
তন মন-মেঁ জো বসা হায় সবকে
বড়া তু উস্সে মেল ।
বড়্হা কে উস্সে' মেল—সাধু
মন-পর পা কাবু ।
—পণ্ডিত ভূষণ

[৯]

কোরাস—

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর ত্রাহিমাম্
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহিমাম্ ।

[১০]

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ'য়ে দিব্য ধামানি তস্থুঃ ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণম্ তমসা পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি
নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায

নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৫ হইতে মুদ্রিত।

চিত্র-পরিবেশক ঃ—অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ